ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1185-1194
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.338

যৌনতা, নারীদেহ, 'স্ল্যাং': লিঙ্গ হিংসা ও ক্ষমতার রাজনীতি

সাবনূর সনম কামিনী, *গবেষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 15.03.2026; Accepted: 17.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Patriarchal authority has long been embedded within language, functioning as a subtle yet powerful mechanism for the subordination of women. One of the most pervasive forms of linguistic violence is the use of derogatory slang terms directed at women, such as which, prostitute, immoral woman, adulteress, and similar expressions. Sexuality and slang are deeply interconnected, as a large proportion of slang terms carry sexual connotations and are socially categorized as "taboo" or "obscene," often falling under various forms of social censorship.Despite this, the use of such expressions is widespread in everyday social interactions—across spaces such as offices, streets, schools, colleges, trains, and buses—where slang is employed in anger, humor, ridicule, or verbal aggression. In the Bengali linguistic context, many commonly used slang expressions revolve around the female body, women's sexuality, psychological attributes, competence, and social status. Consequently, these linguistic practices contribute to the normalization of sexual violence and the objectification of women within society, reducing women to mere bodies or sexual objects rather than recognizing them as full human subjects.

This paper seeks to examine how slang operates as a cultural and linguistic instrument that sustains patriarchal power structures. It further investigates how sexually charged, body-referencing expressions embedded within patriarchal discourse generate and reinforce gender-based violence, thereby functioning as subtle mechanisms of power and social control.The study adopts an empirical research methodology. Primary data were collected through informal interviews with individuals from diverse occupational backgrounds, including students, farmers, laborers, rickshaw-van pullers, housewives, and domestic workers. A total of 45 participants (25 men and 20 women) from Basirhat Block II of North 24 Parganas district, West Bengal, aged between 18 and 65 years, were interviewed between January and June 2025. The participants represented varied educational and socio-economic backgrounds. Secondary data were gathered from books, journals, newspapers, magazines, and relevant online sources.

Keywords: Slang; Female Body; Gender Violence; Power Politics; Patriarchy

স্ল্যাং: শ্লীল বনাম অশ্লীল

সমাজে আবহমান পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতার যে আধিপত্য,ভাষা খোদ সেই আধিপত্যের জমিনকে পোক্ত করতে থাকে তার নির্মিত ভাষার মাধ্যমে। এই ভাষার এক বিশেষ রূপ হলো স্ল্যাং। আমাদের মধ্যেকার রাগ-ক্ষোভ, উত্তেজনা বহিঃপ্রকাশের অন্যতম মাধ্যম স্ল্যাং, আবার বন্ধুবান্ধবের আড্ডায় মজার ছলে উচ্চারিত হয় বিভিন্ন প্রকার স্ল্যাং, যাকে গোদা বাংলায় আমরা গালি বা খিস্তি, অশ্লীল শব্দ, ইতর ভাষা বা ইতর শব্দ, অপভাষা বা অপশব্দ, অকথ্য শব্দ, অপাঙক্তেয় শব্দ ইত্যাদি বলে থাকি।স্ল্যাং-এর এই বাংলা পরিভাষাগুলি নানা দিক থেকে অসম্পূর্ণ, তো সেগুলি যথাযথভাবে স্ল্যাং শব্দটির তাৎপর্য বহন করতে পারে না।তাই স্ল্যাং-এর বাংলা পরিভাষা হিসাবে 'স্ল্যাং' শব্দটিই রাখা যথাযথ।প্রখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক সুকুমার সেন মহাশয় তাঁর 'ভাষার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে বলেছেন, 'যে শব্দ বা পদ ভদ্র লোকের কথ্যভাষায় ও লেখ্য ভাষায় প্রয়োগ হয় না এবং যাহার উৎপত্তি কোন ব্যক্তি বিশেষের অথবা দল বিশেষের হীন ব্যবহার হইতে, তাহাই ইতর শব্দ বা স্ল্যাং'।[1] তবে আমরা দেখবো যে সমস্ত বিষয়ে কোন না কোন সামাজিক ট্যাবু বা নিষেধাজ্ঞা কাজ করে (যেমন- যৌনতা) সে সমস্ত বিষয়ে স্ল্যাং-এর প্রাধান্য। এজন্য অধিকাংশ স্ল্যাং-এর কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে যৌনতাকেন্দ্রিক শব্দ।তবে প্রাচীন ভারতের স্থাপত্য বা সাহিত্যে যৌনতা নিয়ে উদার আলোচনা দেখতে পাওয়া গেলেও ভিক্টোরিয়ান যুগে যৌনতা নিয়ে শ্লীল-অশ্লীলের জটিল আবর্তে ভদ্র সমাজে যৌনতা হয়ে ওঠে নিষিদ্ধ অশালীন, অশ্লীল (vulgar) বিষয় এবং ভদ্র রুচি বিরোধী।তাই এই সময় থেকে স্ল্যাং একটি অশ্লীল বিষয় হিসেবে সামাজিক সেন্সরশিপ-এর আওতায় চলে এলো, এজন্য ভদ্র সমাজে যত্রতত্র স্ল্যাং-এর অবাধ ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ হলো।তবে যারা শ্রমজীবী মানুষ কায়িক পরিশ্রম করেন, তারা যৌনতাসূচক স্ল্যাং-কে ব্যবহার করেন শ্রমের কষ্টকে লাঘব করার প্রয়োজনে। তাই গ্রাম্য সমাজে এই জাতীয় শব্দের প্রয়োগের বিধি-নিষেধের বাধ্যবাধকতা তুলনামূলক কম।তবে স্ল্যাং-এর সাথে ঐ তথাকথিত 'অশ্লীলতা', 'অশালীনতা' সবসময় সম্পর্কিত নয়।প্রকৃতপক্ষে এটা নির্ভর করে শব্দটাকে কীভাবে, কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে তার উপর।আমরা দেখবো যে 'অশ্লীল' শব্দ প্রয়োগভেদে স্ল্যাং হিসেবে গণ্য নাও হতে পারে, আবার 'শ্লীল' শব্দ ব্যবহারের মারপ্যাঁচে স্ল্যাং হিসেবে গণ্য হতে পারে। যেমন—যখন একজন চাষী তার স্ত্রীকে বলছেন, 'ওরে মাগী ভাত খোল রে, মাঠ থেকে আইছি', তখন কিন্তু 'মাগী' শব্দটি নেহাত স্বাভাবিক সম্বোধন হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু যখন একজন ভদ্র সমাজের তথাকথিত শিক্ষিত ছাত্র তার ক্লাসের সহপাঠিনীকে উদ্দেশ্য করে বলছে: 'এক্কেবারে আনারকলি, টুসকি মাল, কচি মাল', তখন কিন্তু এটি আক্ষরিক অর্থেই স্ল্যাং, যেখানে এই যৌনগন্ধী বাচনিক মন্তব্যের মাধ্যমে নারী শরীরকে ধর্ষকামী দৃষ্টিতে লেহন করা হচ্ছে।তো বোঝাই যাচ্ছে যে— অশ্লীলতা ও স্ল্যাং সবসময় একই মুদ্রার উভয় পিঠ একথা ভিক্টোরিয়ান শালীনতার ধারণার একটি নির্মিত মিথ।তবে স্ল্যাং মূলত সংস্কৃতি-নির্ভর এবং সবসময় "contextualized"।সেজন্য এই স্ল্যাং-এর প্রকার ও ধরণ সমাজ, স্থান ও সময়ভেদে ভিন্নতর হয়। কারণ—'এক দেশের বুলি আরেক দেশের গালি'। যেমন— প্রত্যন্ত গ্রাম্য অঞ্চলের মানুষেরা আঞ্চলিক কথ্য ভাষায় 'মাগি' শব্দটি সাধারণ অর্থেই অবলীলায় ব্যবহার করেন কিন্তু এই শব্দগুলো ভদ্র সমাজে গালি বা ইতর শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আবার যুগের পরিবর্তনের সাথে সমাজ পরিবর্তিত হয় এবং সাথে সাথে স্ল্যাং-ও বদলায়। যেমন রামকৃষ্ণ কথামৃতে, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে 'মাগ', 'মাগি' এই শব্দগুলি সাধারণভাবে মেয়ে অর্থে ব্যবহৃত হতো।কিন্তু মাগি শব্দটি আজ একটি অশ্লীল এবং যৌনগন্ধী স্ল্যাং হিসেবেই গৃহীত। ভাষাবিদ ডেল হাইমস-এর 'এথনোগ্রাফি অফ কমিউনিকেশন' তত্ত্ব অনুযায়ী, ভাষার ব্যবহার বোঝার জন্য শুধু শব্দের অর্থ নয়, বরং কে, কাকে, কোথায়, কেন এবং কীভাবে বলছে, তা বিশ্লেষণ করা জরুরি।[2] তাঁর SPEAKING মডেল

আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে একই শব্দ ভিন্ন প্রসঙ্গে ভিন্ন অর্থ বহন করতে পারে—যা 'মাগী' শব্দের গ্রামীণ সম্বোধন ও শহুরে স্ল্যাং-এর মধ্যে পার্থক্য বুঝতে সাহায্য করে।

ফরাসি দার্শনিক মিশেল ফুকো-র ক্ষমতা-জ্ঞান-ভাষার সম্পর্ক বিষয়ক তত্ত্ব থেকে আমরা দেখতে পাই যে ভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়, এটি ক্ষমতা প্রয়োগের একটি হাতিয়ার।[3] ফুকো-র মতে, যে কোনো সমাজে 'ডিসকোর্স' তৈরি করে একটি নির্দিষ্ট জ্ঞান ও সত্যের ধারণা, যা সেই সমাজের ক্ষমতাকাঠামোকে বৈধতা দেয়। আমাদের প্রেক্ষাপটে, পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নারীদেহ ও যৌনতা নিয়ে এক ধরনের 'ডিসকোর্স' তৈরি করেছে, যার একটি অংশ এই স্ল্যাং-গুলি। এই ডিসকোর্সের মাধ্যমেই নারীকে একটি নির্দিষ্ট কাঠামোতে বন্দি করে রাখা হয়। অন্যদিকে, ফরাসি সমাজতাত্ত্বিক পিয়ের বর্দিয়ুর 'প্রতীকী সহিংসতা' (symbolic violence) তত্ত্ব অনুযায়ী, শাসকগোষ্ঠী (এক্ষেত্রে পুরুষতন্ত্র) এমন একটি প্রতীকী কাঠামো তৈরি করে যা শাসিতগোষ্ঠী (এক্ষেত্রে নারী) নিজেরাও স্বাভাবিক বলে মেনে নেয় এবং এই সহিংসতা চিহ্নিতও করতে পারে না।[4] এই স্ল্যাং-গুলির মাধ্যমে নারীর উপর যে ভাষাগত ও মানসিক আঘাত করা হয়, তা নারী নিজেও অনেক সময় স্বাভাবিক বলে মেনে নেন, কারণ এটি তাঁর কাছে শৈশব থেকে দেখা সামাজিক রীতি। সাক্ষাৎকারপ্রাপ্ত ৪৫ বছরের এক গৃহবধূ জানালেন "ছোটোবেলা থেকেই শুনে আসছি বাবা মাকে খানকি- মাগি বলে গাল দিতো, যখন তাদের মধ্যে ঝগড়া হতো,আমার স্বামীও রেগে গেলে আমাকে গাল দেয়,তাতে কি হয়েছে, এটা খুব স্বাভাবিক, আমরা শুনে অভ্যস্ত"। বর্দিয়ুরের তত্ত্বের সত্যতা প্রমাণিত হয় এই উক্তিতে। এই তত্ত্বদ্বয়ের আলোকে আমরা স্ল্যাং-কে পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতা কাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। তবে কোন স্ল্যাং কতোটা শ্লীল বা অশ্লীল তার যথার্থতা বিচার করা আজকের আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয় নয়। বরং ভিক্টোরিয়ান শালীনতাবোধ নির্মিত শ্লীল-অশ্লীলের গণ্ডি টপকে আমরা দেখবো যে আমাদের পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নির্মিত যৌনগন্ধী স্ল্যাং কিভাবে যৌন বিদ্বেষ সৃষ্টি করে নারীকে 'মৌখিক অপমান' (verbal insult) করার মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে যুগ যুগান্তর ধরে। গালাগালের চরিত্র সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় পবিত্র সরকার যথার্থই জানিয়েছেন 'গালাগালের প্রথম শর্ত হবে এই যে তা যথার্থ ক্রোধ ও বিদ্বেষ থেকে উৎসারিত হবে, নিছক বিরক্তি বা ধৈর্যহীনতা থেকে উঠে আসবে না। তা আঘাত করার জন্য উচ্চারিত হবে'।[5]

নারী 'চিকনা মাল': অতীত ঐতিহ্যের অনুরণন:

বাংলা স্ল্যাং-এ মেয়েদের নিয়ে নানা রকম শব্দের যে প্রাচুর্য তাতে মেয়েদের মাল বা উপভোগের জিনিস হিসেবে দেখার প্রবণতাই বেশি। আসলে নারীকে ভোগ্যদ্রব্য হিসেবে দেখার একটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আমাদের চেতনা-অবচেতনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে লালিত, কিন্তু নানা সামাজিক এবং নৈতিক প্রতিবন্ধকতার জন্য নারীকে ভোগ করার যৌনাকাঙ্ক্ষা যখন অবদমিত হতে থাকে, ঠিক তখনই নারীর দেহকে কেন্দ্র করে নানান যৌনগন্ধী স্ল্যাং উচ্চারণ পিতৃতান্ত্রিক সমাজের ধর্ষকামীতাকে তৃপ্ত করে। তাই স্ল্যাং-এর একটা বড় অংশেই নারীর প্রতি অসম্মান, অশ্রদ্ধা ও লালসা দেখা যায়, যেটা আসলে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবস্থান ও অপমানের অতীত ঐতিহ্যের একটি বহমান ধারা, যেখানে মনে করা হয় নারী মানব সত্ত্বা নয়, নারী একটি যৌনসত্ত্বা।ভারতবর্ষীয় সভ্যতার উষালগ্ন থেকে নারীকে আমরা কেবলই ভোগ্য এবং পণ্য হিসেবে ব্যবহার করেছি। বৈদিক যুগেই রোপিত হয়েছিল নারী লাঞ্ছনার বিষবৃক্ষটি। অর্থাৎ প্রায় তিনহাজার বছর পূর্ব থেকেই ভারতবর্ষ নারীকে দেখছে ভোগ্য পণ্য হিসাবেই। খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম শতকেই তৈত্তিরীয় সংহিতাতে উচ্চারিত হয়েছে 'তস্মাদু হ স্ত্রীয় ভোগমেব হারয়ন্তে'। পরবর্তীকালে গৌতম ধর্মসূত্রেও পশু, ভূমি ইত্যাদির সঙ্গে নারীকেও ভোগ্য হিসেবে দেখানো হয়েছে- 'পশু ভূমিস্ত্রীনামনতিভোগঃ'।[6] পৌরাণিক বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে বলা হয়েছে – কন্যা অভিশাপ (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৬/৩/৭/১৩), তাই সন্তান সম্ভবা নারীর একটি অবশ্য করণীয় অনুষ্ঠান হলো পুংসবন, যেন গর্ভের সন্তানটি

পুত্র হয়। নারী মিথ্যাচারিণী, দুর্ভাগ্যস্বরূপিনী, সুরা বা দ্যূতক্রীড়ার মত একটি ব্যসনমাত্র (মৈত্রায়ণী সংহিতা ১/১০/১১, ৩/৬/৩)। সর্বগুণান্বিত শ্রেষ্ঠ নারীও তাই অন্যতম পুরুষের চেয়ে হীন (তৈত্তীরীয় সংহিতা ৬/৫/৮/২)। শতপথ ব্রাহ্মণে আছে স্ত্রী স্বামীর পরে খাবে। কারণ ভুক্তেবাচ্ছিষ্টং বধ্বৈ দদাৎ, খেয়ে এটোটা স্ত্রীকে দেবে (গৃহ্যসূত্র ১/৪/১১)... বাড়ির কুকুর, বেড়াল এবং স্ত্রী একই জাতের জীব বলে এঁটো দিয়েই তাদের প্রতিপালন করা হয়। আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে (১/৯/২৩/৪৫) বলা হয়েছে কালো পাখি, শকুনি, নেউল ছুঁচো ও কুকুর হত্যা করলে যে প্রায়শ্চিত্ত, নারী হত্যা ও শূদ্র হত্যার সেই একই প্রায়শ্চিত্ত, অর্থাৎ মাত্র একদিনের কৃচ্ছসাধন।[7] আমাদের সভ্যতার প্রাচীন নানা ধর্মগ্রন্থে এই সকল বিধি-নিষেধ নারীকে ভোগ্য হিসেবে চিহ্নিত করে এসেছে। তার ফলস্বরূপ পিতৃতান্ত্রিক সমাজের চেতনা-অবচেতনে নারীদেহ সূচক যৌনতাকেন্দ্রিক স্ল্যাং-এর মাধ্যমে নারীকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এখন ছাত্র যুবক থেকে শুরু প্রৌঢ়দের কাছে সুন্দরী যুবতীর সমার্থক হল 'মাল', 'চিকনা মাল', 'ডাঁসা মাল', 'ডবকা মাল', 'জালি মাল', 'কাঁচা মাল' ইত্যাদি। 'মাল' কথার অর্থ পণ্যদ্রব্য। যেহেতু অন্য অনেক পণ্যের মতো নারীও বিনিময়যোগ্য তাই তার সমার্থক হয়ে দাঁড়ায় 'মাল'। তসলিমা নাসরিন লিখছেন—'মাল একটি আরবি শব্দ যার অর্থ পণ্যদ্রব্য। মুসলিম হাদীস শরীফে লেখা—"দুনিয়ার সব কিছু ভোগের সামগ্রী আর দুনিয়ার সর্বোত্তম সামগ্রী হচ্ছে মেয়েমানুষ।" বিনিময় পণ্য হিসেবে, মূল্যবান দাসী হিসাবে, দামী সামগ্রী হিসেবে সমাজে নারীর অবস্থান বলেই নারীকে 'মাল' বলে ডাকতে কারো দ্বিধা নেই। ওরা ডাকে কারণ ধর্ম ওদের ইন্ধন জোগাচ্ছে, সমাজ ও রাষ্ট্র ওদের আস্কারা দিচ্ছে।[8] হিন্দু সংস্কৃতি এবং শাস্ত্রের মত ইসলাম শাস্ত্র নারীকে ভোগ্যপণ্যের চোখে দেখেছে। —'তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শস্যক্ষেত্র। অতঃপর তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করিবে (সূরা বাকারা ২২৩ আয়াত)... সূরা নিসার ৩৪ আয়াতে আছে— পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লাহ তাহাদের এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন এবং পুরুষ তাহাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। ...স্ত্রীদের মধ্যে যাহাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাহাদিগকে সদুপদেশ দাও, তারপর তাহাদের শয্যা বর্জন কর এবং তাহাদিগকে প্রহার কর।[9] বোঝাই যাচ্ছে ধর্মের চোখেও নারী মানুষ নয়, তাই নারীদের উপর শারীরিক নির্যাতনের পাশাপাশি গাল-খিস্তি প্রয়োগ করে, ভাষা সন্ত্রাসের মধ্যে দিয়ে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নারীর উপর মনস্তাত্ত্বিক নিপীড়ন চালায়।

প্রাচীন ভারতীয় সমাজে নারী যে অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের সঙ্গে বিবেচিত হতো তার প্রমাণ সর্বত্র ছড়িয়ে আছে, মহাভারতে দেখা যায় ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে জুয়া খেলায় পন রাখলেন, ...বিনা প্রতিবাদে সভার মধ্যে দ্রৌপদীর উপর ঘটা যৌনহেনস্থা দেখে গেলেন। রামায়ণে আমরা দেখেছি শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে উদ্ধার করলেও তার সতীত্বের পরীক্ষা করছেন। আবার শাস্ত্রে বলা হচ্ছে নারী নরকের দ্বার, নারী অপবিত্র, যজ্ঞকালে শূদ্র, কুকুর ও নারী দর্শন নিষিদ্ধ, নারী দুর্ভাগ্যস্বরূপিনী ইত্যাদি, অর্থাৎ প্রাচীন কাল থেকে আজ অবধি সভ্যতার অগ্রগতি ঘটলেও নারী মনুষ্য গোত্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি।আমাদের সমাজের নারী দৃষ্টির এহেন ঐতিহ্যের উত্তরসূরী হিসেবে আমরা যখন নারীর প্রতি ঘৃণা, অবজ্ঞা ও লালসাপূর্ণ কটুক্তি করি, স্ল্যাং ব্যবহার করি তখন কোথাও একটা ঐতিহ্যের অনুরণন ঘটে, তাই নয় কি? দ্রৌপদীদের বস্ত্রহরণের রেওয়াজ বর্তমানেও সমানভাবে অব্যহত। সুযোগ পেলেই 'সুযোগের অভাবে চরিত্রবান পুরুষরা' উক্ত কর্মে পিছুপা হন না। আর যখন সুযোগ অধরা অথচ প্রবৃত্তি ষোল আনা তখন দুধের স্বাদ ঘোলে মিটানোর মত বেরিয়ে আসে কচি মাল, নি-মাই (স্তনহীন নারী), চমচম, টুসকি মাল, ফুলটুসি, জিবে গজা, চুলবুলি, আনারকলি, ছিনাল মাগী, ব্লু হট, চাবুক-মাল, প্রভৃতি যৌনগন্ধী স্ল্যাং। এই স্ল্যাং গুলির মাধ্যমে নারীর প্রতি গোটা সমাজের লোলুপ ধর্ষকামী দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়ে পড়ে। 'শিক্ষিত ভদ্র সমাজের' ছাত্র যুবদের এইসব শব্দ এবং ভাষা আমাদের অতীত ঐতিহ্যের অনুসারী। ডক্টর সত্যজিৎ গোস্বামী যথার্থই বলেছেন 'অকথ্য শব্দাবলীর একটি বড় অংশ নারীর প্রতি

অসম্মান ও লালসা চিহ্নিত। পথে ঘাটে বাসে ট্রেনে চলতে গিয়ে প্রায় বিকৃত মানসিকতার সশব্দ উচ্চারণ আপনাকে শুনতে হবে। এইসব অশ্লীল অকথ্য শব্দের ফুলঝুরি শুনতে শুনতে তথাকথিত মার্জিত রুচি মানুষের ভ্রু ও মন যতই সংকুচিত হোক, যুবসমাজের চূড়ান্ত অবক্ষয়ের প্রতি প্রবল ঘৃণার অগ্নিস্রোত যতই বয়ে যাক না কেন বুকের তলায়, তবু মনে রাখতে হবে এই প্রবল বিকার সাম্প্রতিকও নয়, আমাদের সামগ্রিক সামাজিক ইতিহাস থেকে আদৌ বিচ্ছিন্ন নয়'।[১০]

শুধু ভারতীয় উপমহাদেশ নয়, বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তেও নারীদেহকেন্দ্রিক স্ল্যাং-এর প্রচলন দেখা যায়। ইংরেজি ভাষায় 'bitch', 'whore', 'slut' শব্দগুলি ঠিক একইভাবে নারীর যৌনাচার ও চরিত্রকে আক্রমণ করতে ব্যবহৃত হয়।[11] স্প্যানিশ 'puta', ফরাসি ভাষায় 'salope' শব্দগুলির ব্যবহারও একই পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতার পরিচয় বহন করে।[12] অর্থাৎ, নারীদেহ ও যৌনতাকে কেন্দ্র করে স্ল্যাং-এর এই প্রয়োগ শুধু বাঙালি সমাজের নয়, এটি বিশ্বব্যাপী পিতৃতন্ত্রের একটি সাধারণ কৌশল। নারীবাদী ভাষাতাত্ত্বিক ডেল স্পেন্ডার তাঁর 'ম্যান মেড ল্যাঙ্গুয়েজ' গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে ভাষা পুরুষের দ্বারা নির্মিত এবং তা পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গিই প্রতিফলিত করে।[13] ভাষায় নারীর অভিজ্ঞতার জন্য শব্দের অভাব আছে এবং নারীদের বোঝাতে ব্যবহৃত শব্দগুলি অধিকাংশ সময় নেতিবাচক বা যৌনাঙ্গীভূত—যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ 'বেশ্যা', 'ছিনাল'-এর পুরুষবাচক শব্দের অনুপস্থিতি।

স্ল্যাং: আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দু নারীর দেহ, যৌনতা:

সমাজে বৈষম্য টিকিয়ে রাখার অন্যতম বড় হাতিয়ার হলো ভাষা। শব্দ নির্বাচন ও ভাষার ব্যবহারের সঙ্গে মিশে থাকে ক্ষমতায় টিকে থাকার রাজনীতি। একটি সমাজে নারীর অবস্থান অনেকটাই প্রতিফলিত তাঁর প্রতি ভাষায় ব্যবহারে। গালিগুলোকে উদারভাবে আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতির অংশ হিসেবে দেখানোর ফলে বৈধতা পায় গালির মাধ্যমে নারীর প্রতি শোষণ, নির্যাতন আর অপমান। আমাদের সমাজে প্রচলিত গালিগুলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যৌনগন্ধী এবং নারীকে অসম্মান করার প্রবণতায় দূষিত। সেই সঙ্গে শারীরিক নির্যাতনের পাশাপাশি নারীকে যে নানা ধরণের মানসিক নিগ্রহের (psychological violence) শিকার হতে হয়, তার একটি বড় অংশ হয় নেতিবাচক নানা স্ল্যাং-এর মাধ্যমে, যেগুলো দিয়ে নারীর কর্মদক্ষতা বা যোগ্যতা খাটো করা হয়। যেমন—মুখরা (যে নারী খোঁচা দিয়ে বেশি কথা বলে), ঝগড়াটে (যে ঝগড়া করে, কিন্তু কোন আগ্রাসী পুরুষের জন্য এই শব্দ ব্যবহার হয় না), মাল (আকর্ষণীয় নারী), বন্ধ্যা/বাজা (সন্তান নেই যার), পোড়ামুখী (খারাপ ভাগ্য যার), ডাইনী, খানকী বা বেশ্যা, ছিনাল, কুটনি, অসতী, নটী, ব্যাভিচারিণী, কুলটা, পতিতা, ভ্রষ্টা, নষ্ট মেয়ে ইত্যাদি ইত্যাদি। একটু লক্ষ করলেই দেখা যায়, বাংলা ভাষায় এইসব স্ত্রীবাচক স্ল্যাং-এর পুরুষবাচক কোনো শব্দ নেই। সাধারণত শরীর বিক্রি করা মেয়েদের উপাধি হয়েছে বেশ্যা শব্দটি। তবে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নির্মিত লক্ষণরেখা অতিক্রম করে রাতে বাইরে ঘোরাফেরা করে, পুরুষতান্ত্রিক অবদমনকে মেনে না নিয়ে নিজের স্বাধীনতায় বাঁচতে চায় সেই সমস্ত অবাধ্য মেয়েদেরও বেশ্যা বলার চল আছে। আবার সতীত্ব নামক যৌন পবিত্রতা কেবল নারীরই রক্ষা করতে হবে। পুরুষের জন্য সতীত্বের সমার্থক শব্দ আজ অবধি কোনো অভিধানে ওঠেনি। বসিরহাটের ৩২ বছরের ইটভাটা- শ্রমিক রমেশ মন্ডল সরল সুরে জানালেন: "ঘরের বউ প্রেম করলে সে ছিনাল, বেশ্যা হয়ে যায়"। কিন্তু তাঁর স্ত্রী মিতা দেবীর মত ভিন্ন: "উনি আমাকে বাজা মাগী বলে গালি দেন, অন্য জায়গায় প্রেমের সম্পর্ক করে, তখন উনি সাধু পুরুষ। বাচ্চা না হওয়া আমার একার অপরাধ নাকি?"(ব্যাক্তিগত সাক্ষাৎকার)

তো দেখা যাচ্ছে বাংলা ভাষায় প্রচলিত গালির অধিকাংশই নারীর শরীর, মনস্তত্ত্ব, কর্মদক্ষতা, সামাজিক অবস্থান কিংবা তাঁর যৌনতাকে কটাক্ষ করে আবর্তিত। আসলে গালির সঙ্গে জড়িত আছে ক্ষমতার রাজনীতি। নিজের স্বাধীন অস্তিত্ব নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ানো একজন নারীকে দমিয়ে রাখতে হলে সবচেয়ে ধারালো অস্ত্র

তার চরিত্রে আঘাত করে গালি দেওয়া। কোনোভাবে তাকে চরিত্রহীন বলতে পারলেই হলো। প্রমাণ করারও দরকার হবে না, নারী মানসিকভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়বে। নারীকে আক্রমণ করার জন্য প্রচলিত কিছু ভাষিক বর্বরতার দৃষ্টান্ত দেখা যাক— 'বেশ্যা মাগী', 'পতিতা', 'খানকি', 'আঁটকুড়ো', 'বাঁজা মাগী', 'আগুনখাকি', 'কুটনী মাগী', 'ঢ্যামনা মাগী', 'দজ্জাল মাগী', 'এজমালি মাগী', 'গতরখাকি', 'ঢলঢলে মাগী', 'দুলকি মাগি', 'বাচাল মাগী', 'হুমদো মাগী', 'সাত ভাতারী সাবিত্রী', 'বাজারী মাগী', 'কাউরা মাগী', 'বারো ভাতারী' প্রভৃতি। বাংলা প্রবাদে আমরা শুনতে পাই: "ঢ্যামনা মাগীর ঢ্যামনা মন, পরপুরুষকে করে আপনজন।"[14]

প্রচলিত গালিগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, নারীর যৌন অঙ্গ কিংবা তাঁর যৌনতাকে ঘিরে বলা গালিতে ফুটে ওঠে পুরুষের ধর্ষকামী চেতনা এবং বিকৃত কামবাসনা। পুরুষের এই ধর্ষকামী মানসিকতা দ্বারা প্রভাবিত হন নারীও। একই সমাজে বেড়ে ওঠা নারীও স্বগোত্রের প্রতি অবমাননাকর এই শব্দগুলোকেই প্রয়োগ করেন অবলীলায়। বাংলা ভাষার গবেষক সুকুমার সেন তার 'বাংলায় নারীর ভাষা' প্রবন্ধে কিছু শব্দের কথা উল্লেখ করেছেন—যা থেকে পুরুষ ও নারীর সামাজিক অবস্থান স্পষ্ট হয়, যেমন— 'অনাছিষ্টি', লক্ষ্মীছাড়া, 'আঁটকুড়ো', 'আড়ি', 'আদিখ্যেতা', 'কুটনী', 'খোঁটা', 'গাদী', 'গুমর', 'গা', 'ছিরি', 'ঠমক', 'ঢঙ', 'দেমাক', 'ন্যাকা', 'পোয়াতি', 'বিয়েন', 'কুট্টি', 'মিনসে', 'রাঁড়', 'রাঁড়ী', 'সেয়ানা', 'সোমত্ত', 'সোহাগ', 'সই' ইত্যাদি।[15]

আমরা জানি যে সামাজিক অর্থ নির্মাণে 'মেয়েলি' শব্দটি দিয়ে মেয়েদের আবেগী, যুক্তিহীন, কোমল, অবলা, 'নরম', 'লজ্জাবতী' প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য দিয়ে চিহ্নিত করা হয়, অপরদিকে পুরুষালি শব্দটি দিয়ে পৌরুষ, শক্তি, ক্ষমতার দম্ভ প্রকাশিত হয়। এখানেই নিহিত ভাষার রাজনীতি। তাই আমরা যখন দেখি কোনো ছেলে পৌরুষের ছক ভেঙ্গে কোমল আচরণ করছে, সাজতে চাইছে, তখনই তাঁর স্বভাবকে 'মেয়েলি' স্বভাব বলে বা 'মেয়েলোক', 'মেয়েছেলে', 'হাফ-লেডিজ' ইত্যাদি বলে কুৎসিতভাবে অপমান করা হয়। এর পাশাপাশি যেসব পুরুষ স্ত্রীর কথামতো চলে, তাদের উপহাস করে বলা হয় 'স্ত্রৈণ'। এই শব্দটি প্রয়োগ হয় পুরুষের জন্য নেতিবাচক, অসম্মানজনক, অগৌরবজনক হিসেবে। আবার অপরদিকে মেয়েরা যদি কোড অব কন্ডাক্টের লক্ষণরেখা অতিক্রম করে রাতে বাইরে চলাফেরা করে, প্রশ্নহীন আনুগত্যের বাইরে এসে তর্ক করে, জোরে হাঁটে, ক্রিকেট খেলে, গাছে ওঠে, সোজা কথায় পুরুষতান্ত্রিকতাকে অস্বীকার করে তখন তার স্বভাবকে 'মদ্দা স্বভাব', 'দস্যি মেয়ে' ইত্যাদি বলে আক্রমণ করা হয়।

আসলে স্ল্যাং-এর মাধ্যমে কীভাবে নারীকে অবদমন, হেয় প্রতিপন্ন, তুচ্ছ, খাটো, নিন্দা বা অপমান করা যায় তার জন্যই পুরুষ তৈরি করে নিয়েছে আলাদা স্ল্যাং পরিভাষা, যার মাধ্যমে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নারীর প্রতি চালায় ভাষিক নিপীড়ন। সভ্যতার এতোটা অগ্রগতি হলো, নারীরা ঘরের চারদেয়ালের বাইরে বেরিয়ে এসে রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান সর্বত্র নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখছেন, কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক ভাষাসন্ত্রাসের মুখে আজো নারীদের ক্ষতবিক্ষত হতে হয়। আমরা দেখেছি বিধানসভা থেকে শুরু করে লোকসভায় পর্যন্ত নির্বাচিত নারী জনপ্রতিনিধিকে তাদের বেশভূষার জন্য পুরুষ প্রতিনিধির কটাক্ষ বাক্যবাণে বিদ্ধ হতে হয়। বর্তমানে আমাদের রাজ্য রাজনীতির দিকে চোখ রাখলে দেখতে পাচ্ছি অকথা-কুকথার কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি চলছে অবিরত, তার উপরে রাজনীতির রাঘববোয়ালদের মুখে অকথ্য স্ল্যাং-এর মাধ্যমে মা-বোনকে তুলে হুমকি থ্রেটের কালচার যৌন বিদ্বেষকে কতোখানি প্রশ্রয় দিচ্ছে ভাবলে শিহরিত হতে হয়। এই যৌন বিদ্বেষী মন্তব্য ক্ষমতার প্রশ্রয়ে থাকার জন্য ধর্ষণের রমরমা বাড়ছে, যৌন হিংসার ঘটনা বাড়ছে।

জুডিথ বাটলারের 'পারফরমেটিভিটি' তত্ত্ব অনুযায়ী, লিঙ্গ পরিচয় কোনো স্থির সত্তা নয়; এটি বারংবার ভাষা ও আচরণের মাধ্যমে 'সম্পাদিত' হয়।[16] বাংলা স্ল্যাং-এ নারীদেহ সূচক শব্দগুলির পুনঃপুন প্রয়োগ আসলে নারীর একটি নির্দিষ্ট লিঙ্গ পরিচিতি নির্মাণ করে—যে পরিচিতিতে নারী কেবল একটি যৌনসত্ত্বা, ভোগের

বস্তু।যখন কোনো ছাত্র দল বন্ধুদের মধ্যে 'চিকনা মাল' বলে একটি মেয়েকে আখ্যায়িত করে, তখন তারা কেবল একটি শব্দ ব্যবহার করছে না, তারা নারীর দেহ ও অস্তিত্ব সম্পর্কে একটি বিশেষ 'সত্য' বারবার রচনা করছে, যা পরিণামে নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করে। এই ভাষিক পারফরমেন্স দিনের পর দিন চলতে থাকলে তা একটি 'স্বাভাবিক' ও 'প্রাকৃতিক' সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ছাত্র সমাজ ও যৌন ইঙ্গিতবাহী স্ল্যাং: যৌন হিংসার আঁতুড়ঘর:

বর্তমান দিনে ছাত্র সমাজের মধ্যে আড্ডা ইয়ার্কির ছলে যে স্ল্যাং গুলি প্রয়োগ করা হয় তার বেশিরভাগটাই নারী অঙ্গ মূলত যৌনাঙ্গের প্রতি লালসা-জ্ঞাপক শব্দ। বিকৃত কাম মানসিকতাই স্ল্যাং-এর অনেকটা অংশ জুড়ে আছে, তাই নারীর স্তন, নিতম্ব, যৌনাঙ্গগুলিই স্ল্যাং-এর কেন্দ্রবিন্দু। ছেলেরা মেয়েদের নিয়ে যেসব মজা করে সেগুলো ভীষণ রকম সেক্সিস্ট হিউমর হয়ে থাকে, যেমন কলেজের হালকা গড়নের মেয়েটিকে নামকরণ করা হয় 'নি-মাই' আর একটু ভারী গড়নের মেয়েটিকে ডাকা হয় 'লাউ' নামে। এই ধরনের যৌন রসিকতা যৌন বিদ্বেষকে প্রশ্রয় দেয়, যৌন অপরাধকে প্রত্যক্ষ ইন্ধন জোগায়, তাই নয় কি? সামাজিক ধর্ষণ ইচ্ছার প্রকাশ দেখা যায় আজকের দিনের ছাত্র-যুবদের 'ব' সূচক পুরুষাঙ্গ শব্দের আধিক্যের মধ্যে। শব্দটির এতই আধিক্য যে অনেকের কাছে এটি মুদ্রাদোষে দাঁড়িয়ে গেছে। 'মাদারচোদ', 'বানচোদ', 'রেন্ডির বাচ্চা', 'খানকির ছেলে' এই সমস্ত স্ল্যাং গুলির আকছার বাচনিক প্রয়োগ দেখা যায় ছাত্র সমাজে, এগুলোর মাধ্যমে আসলে তাদের যৌন বিকার মানসিকতার ব্যাপকতর বহিঃপ্রকাশ ঘটে। একাদশ শ্রেণীর এক ছাত্র (১৮) স্বীকার করলো—"বন্ধুদের সাথে আড্ডার সময় ক্লাসের বিভিন্ন সহপাঠিনীদের উদ্দেশ্য করে নানারকম ঠাট্টা -ইয়ার্কি করি, যেমন একটু স্থূল সহপাঠিনীকে লাউ বলে ডাকি, সুন্দরী সহপাঠিনী কে আনারকলি বলি, এগুলো নিছক মজা করে বলি"!

ছাত্র সমাজের এই মানসিক বিকারকে প্রশ্রয় দিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে গণমাধ্যমগুলির প্রত্যক্ষ ভূমিকা আছে। আজকের দিনে হলিউড, বলিউড, টলিউড সর্বত্র সিনেমায় হিংসা, খুন, ধর্ষণ ইত্যাদির রমরমা। বিজ্ঞাপনী প্রচারে নারীদেহকে ভোগ্যপণ্য হিসেবে, যৌন বস্তু (sexual object) হিসেবে উপস্থাপনের প্রবণতা লাগামছাড়া হয়ে উঠেছে, আবার ফ্যাশন শো, সুন্দরী প্রতিযোগিতার নামে দেখানো হয় আসলে নারীর শরীরের নানান খাজ ও ভাঁজগুলি। নারীর 'sexy' রূপে দেখার বাসনা এতই উগ্র যে এখন যে কোনো সিনেমাতে 'আইটেম ড্যান্স' অতি আবশ্যক রাখতে হয়। স্ল্যাং-এর পরিভাষায় নতুন সংযোজন হলো আরেকটি অসম্মানজনক শব্দ 'আইটেম গার্ল'। দর্শকের এই চাহিদার মধ্যে ধরা পরে আমাদের সামাজিক গণমনস্তত্ত্বের ছবি। লরা মুলভির 'মেল গেজ' তত্ত্ব অনুযায়ী, সিনেমা ও গণমাধ্যমের চিত্রায়ণে নারী সবসময় পুরুষের দৃষ্টির 'বস্তু' হিসেবে উপস্থাপিত হন; পুরুষ হল 'বীক্ষক' আর নারী হল 'দর্শনীয় বস্তু'।[17] স্ল্যাং-এর মাধ্যমেও নারীকে পুরুষের এই 'ভাষিক দৃষ্টির' বস্তু বানানো হয়—'চিকনা মাল', 'টাইট মাল', 'আইটেম গার্ল' প্রভৃতি পরিভাষা আসলে নারীদেহকে পুরুষের লালসার 'গেজ'-এর সামনে উপস্থাপন করে।ছাত্র সমাজে নারীদের ইভটিজিং করা খুবই সাধারণ ঘটনা বলে ধরা হয়,ছাত্র সমাজ মনে করে আড্ডা ইয়ার্কির ছলে একটু আধটু ইভটিজিং তো করাই যেতে পারে, এটা ছাত্র বয়সের ধর্ম। তো এই ইভটিজিং নামে নারীকে 'উত্ত্যক্ত' করার এবং বিরক্ত করার পারিভাষিক শব্দ পর্যন্ত তৈরি হয়েছে ছাত্র সমাজে। খাদ্যদ্রব্য, ফল, বাদ্যযন্ত্র, অস্ত্র, এই সব বিষয়কে বিকৃত অর্থে ব্যবহার করা হয় নারীকে ভাষিক নিপীড়ন করার জন্য। যেমন— 'রসে ভরা কমলা', 'টাইট মাল', 'কচি ডাব', 'এটম বোম', 'মিষ্টি তেঁতুল', 'তানপুরা', 'গাড়ির চেসিস', 'ডবল ডেকার', 'গোলাপ জাম', 'কোম্পানির মাল', 'মাগির গ্যারেজ বড়', 'কালনাগিনী', 'কাশবন', 'কচি মাল', 'ইন্ডিয়া গেট', 'জাম্বুরা', 'গোলাপি আপেল', 'দুধের ট্যাঙ্কার' ইত্যাদি। আবার যৌন ইশারাযুক্ত স্ল্যাং ভদ্র সমাজে তেমন চল না থাকলেও এমন কিছু শব্দ আছে যা আপাতভাবে অশ্লীল বলে মনে না হলেও ইঙ্গিত কিন্তু পরিষ্কার থাকে, ছাত্র সমাজে এগুলোর প্রচলন বেশি। যেমন—ওল্টানো কড়াই (সুদৃশ

নিতম্ব), খাল (বহু ব্যবহৃত যোনি), বালিশ ওয়ালি (বৃহৎ স্তন যুক্ত মহিলা), লোডেড মাল (গর্ভবতী মহিলা)। আবার '... মেরে দেবো', 'লাগাবো', 'খেলা হবে' এগুলো ইশারা ইঙ্গিতে বলার মাধ্যমে ছাত্রসমাজের মধ্যেকার সুপ্ত ধর্ষণেচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। উপরোক্ত শব্দগুলো যেগুলো যৌনতা, কামুকতা ও নোংরামিতে ভরপুর সেগুলো নারীর দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাথে সাদৃশ্য করে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে ছাত্রসমাজের একাংশ তাদের মধ্যেকার বিকৃত যৌনকামনাকে তৃপ্ত করার হয়তো প্রয়াস চালায়।

দেখা যাবে বাংলা স্ল্যাং-এ মেয়েদের নিয়ে নানা রকমের শব্দের প্রাচুর্য, সেখানে নারীকে দেখা হচ্ছে যৌনবস্তু হিসাবে। আমরা শুধু 'মেয়ে' শব্দের যত রকম প্রতিশব্দ বাংলা স্ল্যাং-এ আছে তার যদি একটা তালিকা করি তাহলে তার বিস্ময়কর পরিভাষা ধরা পড়বে— 'আগুন, আনারকলি, কমলি খরশি, খাপচু, গুড গুডস, গুড়িয়া, গোলাপ জাম, চামকি, চাম্পি, চিকনা, চিজ, চিড়িয়া, চুটকি, চুলবুলি, চাঁদনী, ছাম, ছেমড়ি, জি টু, ঝিল্লি, টিশু, তুবড়ি, দুগ্গি, নল, পাটি, পানসি, পিস, ফানটুস, ফোর ফরটি, ভাতি, মাল, মিছরি, রঙ্গিলা, লগদা ইত্যাদি'।[18]

বলাবাহুল্য এই জাতীয় শব্দ ব্যবহারের মধ্যে প্রতিফলিত হয় পুরুষের প্রচ্ছন্ন ধর্ষণকামিতা, যেখানে মেয়েদের উপভোগের বস্তু হিসাবে 'যৌন বস্তু' (sexual object) হিসেবে দেখার প্রবণতাটাই বড়। নারী সম্পর্কে এই অশ্রদ্ধার বোধ, অসম্মানের রীতি শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে বাঙালি পুরুষের স্ল্যাং-এ পাওয়া যায়। সমাজের উচ্চমহলে শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নারী সম্পর্কিত ধারণায় হয়তো সামান্য কিছু পরিবর্তন হয়ে থাকতে পারে কিন্তু স্ল্যাং-এর প্রয়োগের ক্ষেত্রে তার কোন বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি। বিশেষত তরুণ প্রজন্ম বা ছাত্র সমাজে এ বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। নারীকে যৌনসত্ত্বা হিসাবে চিহ্নিত করার জন্য কিছু পরিভাষা তৈরি হয়েছে ছাত্র সমাজে, যেগুলো প্রতিনিয়ত খুব স্বাভাবিকভাবে আকছার ব্যবহৃত হয়।

স্তন: আতা, আনারদানা, আপেল, আমসি, উই ঢিবি, গ্যানা, চুঁচি, নিমকি, নিমাই, পিরামিড, ফজলি আম, বাতাবি, বুটকি, বেগুন, বেগুন পোড়া, মাই, মেশিন, ম্যানা, লুচি, সিঙ্গারা, হেডলাইট।

যোনি: গাঁড়, গুদ, গুহা, চুত, চেরাপুঞ্জি, চ্যাট, ফুটো, মন্দির, মাং, স্বর্গ, স্বর্গদ্বার, হোল।

পশ্চাদ্দেশ: কত দিবি কত নিবি, কি দিবি কি নিবি, ডবল ডেকার, ডেকচি, তবলা, তানপুরা, তুই থাক আমি যাই, দুলকি, দোলন।

নাভি: খিড়কি, টুনি, পেটি।[19]

আসলে, ভদ্র সমাজের শিক্ষিত তরুণ প্রজন্মের মধ্যে নারীর প্রতি মানবিক সম্মানবোধের ধারণা গড়ে ওঠে নি, নারীকে কেবল যৌনযন্ত্র হিসেবে চেনে, তাই শ্লীলতাহানি, ধর্ষণ, যৌননির্যাতনের ঘটনা উত্তরোত্তর মহামারির আকার নেবে, তাতে আশ্চর্য হওয়ার অবকাশ থাকবে না, কারণ এই সমাজ তরুণ প্রজন্মের এই ধর্ষকামী মানসিকতাকে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে।

উপসংহার: রমণী সুন্দর হয় 'মনুষ্যত্ব' রক্ষণে:

ভিক্টোরিয়া যুগের শালীনতাবোধকে আজও আমরা সর্বাংশে বাদ দিতে পারিনি। ফলে সমাজে যৌনতা নিয়ে এখনো ট্যাবু রয়েই গেছে। মজার ব্যাপার হলো জনসংখ্যার নিরিখে পৃথিবীর প্রথম স্থান দখল করা সত্ত্বেও ভারতীয় সমাজে যৌনতা সম্পর্কিত মুক্ত আলোচনায় এখনও এতো প্রবলতম নিষিদ্ধ, রাখঢাক, গুড়গুড় ব্যাপার রয়ে গেছে যে, যৌনতাকে নোংরা, অশ্লীল বিষয় রূপে বিবেচনা করে স্ল্যাং প্রয়োগের মাধ্যমে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের কুশীলবরা তাদের ভিতরকার অতৃপ্ত ধর্ষকামীতাকে তৃপ্ত করে থাকে। আর যেহেতু প্রাচীনকাল থেকেই 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা' থেকে মনুর অন্য সব বিধানে নারীকে কেবলমাত্র ভোগ্যা, ব্যবহার্য শরীর হিসাবে দেখা হয়েছে, সেই প্রাচীন ধারা অনুসারে নারী বর্তমানেও সমাজের চোখে শরীরসর্বস্ব প্রোডাকশন মেশিন, যৌনসত্ত্বা;

আকর্ষণীয় স্তন, যোনি, উরু, নাভি এগুলোর মধ্যেই নারীর পরিচিতি সীমাবদ্ধ। সমাজের চোখে নারী তাই কেবলই মেয়েমানুষ, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ মানুষ নয়। আমরা দেখবো যে পুরুষ শব্দের সমার্থক হিসেবে মানুষ কিংবা মনুষ্য শব্দ আছে অভিধানে কিন্তু নারী শব্দের সমার্থক হিসাবে তা নেই। এইভাবে আমাদের সংস্কৃতিতে ভাষাগত লিঙ্গ রাজনীতি ডালপালা মেলে আছে। নারী যেহেতু মানুষ নয়, শরীর, তাই নারীর শরীরকে স্ল্যাং-এর মাধ্যমে রগরগে উপস্থাপন করা হয় আকছার। আর স্ল্যাং-কে নিম্নশ্রেণীর মুখের ভাষা হিসেবে ধরা হলেও বাস্তব অন্য কথা বলে। আসলে ভিক্টোরিয়ান শালীনতাবোধের মুখোশ পরে থাকলেও ভদ্র সমাজের তথাকথিত শিক্ষিত রুচিশীল সংস্কৃতিমনস্ক মানুষের মুখোশের আড়ালে ঘাপটি মেরে থাকে এক বিকৃতকাম মানসিকতা, সুযোগ পেলেই মুখোশের আড়াল থেকে গলগল করে নির্গত হয় নারীদেহ সূচক যৌনগন্ধী স্ল্যাং-এর ফুলঝুরি।এই পিতৃতান্ত্রিক সমাজে অদ্ভুত দ্বিচারিতা দেখা যায়। এই সমাজ একহাতে নারীকে মাতৃজ্ঞানে, দেবী জ্ঞানে পূজা করে, আবার পিতৃতান্ত্রিক লক্ষণরেখা ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে চাইছে যে নারী, তছনছ করে দিতে চাইছে স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণের ছক, তাকে 'বেশ্যা মাগী' বলে গালি দেয়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুললেই তাকে 'ডাইনি' বলে পুড়িয়ে মারে। প্রশ্নহীন আনুগত্যের বাইরে যেতে চাইলে তাকে 'ছিনাল' বলে তার জিভ কেটে দেয়, 'অসতী খানকি' বলে জীবন্ত কবর দেয়। আবার ছাত্র সমাজের ইভটিজিং-এর পরিভাষাগুলো সমাজ উদারচিত্তে প্রশ্রয় দেওয়ার ফলে সমাজে ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি ও যৌন হিংসার ঘটনা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে।এইভাবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের আধিপত্যবাদ বজায় রাখার জন্য নারীদেহকে নিয়ে তৈরি হয়েছে ভাষাগত লিঙ্গ রাজনীতি। বেশ্যা, অসতীর পুংবাচক শব্দ অভিধানে কি কখনও লেখা হবে? শরীরের ঊর্ধ্বে, যৌনযন্ত্রের ঊর্ধ্বে গিয়ে কবে এই সমাজ নারীদের মানুষ হিসাবে দেখতে শিখবে? এইসব প্রশ্নের উত্তরের জন্য কি আরো কয়েক শতাব্দী অপেক্ষা করতে হবে?

তথ্যসূত্র:

১. সেন, সুকুমার। ভাষার ইতিবৃত্ত। ইস্টার্ন পাবলিকেশন, ১৯৮৩, কলকাতা, পৃ. ১২।

২. হাইমস, ডেল। ফাউন্ডেশনস ইন সোশিওলিঙ্গুইস্টিকস: অ্যান এথনোগ্রাফিক অ্যাপ্রোচ। ইউনিভার্সিটি অফ পেনসিলভানিয়া প্রেস, ১৯৭৪, ফিলাডেলফিয়া, পৃ. ৫৩-৬২।

৩. ফুকো, মিশেল। দ্য আর্কিওলজি অব নলেজ অ্যান্ড দ্য ডিসকোর্স অন ল্যাঙ্গুয়েজ। এ. এম. শেরিডান স্মিথ অনূদিত, প্যানথিয়ন বুকস, ১৯৭২, নিউ ইয়র্ক, পৃ. ২১৫-২১৭।

৪. বর্দিয়ু, পিয়ের এবং জঁ-ক্লদ পাসেরোঁ। রিপ্রোডাকশন ইন এডুকেশন, সোসাইটি অ্যান্ড কালচার। রিচার্ড নাইস অনূদিত, সেজ পাবলিকেশনস, ১৯৯০, লন্ডন, পৃ. ৪-৬।

৫. সরকার, পবিত্র। লোকভাষা-লোকসংস্কৃতি। চিরায়ত প্রকাশন, ২০০৩, কলকাতা, পৃ. ১০৩।

৬. গোস্বামী, সত্রাজিৎ। বাংলা অকথ্যভাষা ও শব্দকোষ। জয় দুর্গা লাইব্রেরী, ২০০০, কলকাতা, পৃ. ৯৯।

৭. নাসরিন, তসলিমা। নির্বাচিত কলাম। আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৪, কলকাতা, পৃ. ২৩।

৮. তদেব ,পৃ. ১৭।

৯.তদেব, পৃ. ৬৮।

১০. গোস্বামী, সত্রাজিৎ। বাংলা অকথ্যভাষা ও শব্দকোষ। জয় দুর্গা লাইব্রেরী, ২০০০, কলকাতা, পৃ. ৯৯।

১১. ক্যামেরন, ডেবোরা। ফেমিনিজম অ্যান্ড লিঙ্গুইস্টিক থিওরি। প্যালগ্রেভ ম্যাকমিলান, ১৯৯২, লন্ডন, পৃ. ১০২-১০৫।

১২. মোলিনার, রোজিও। 'ওমেন অ্যান্ড স্ল্যাং ইন স্প্যানিশ: আ কালচার্যাল পারস্পেকটিভ', জার্নাল অফ জেন্ডার স্টাডিজ ২৫, নং ৩ (২০১৬): ২৭৬-২৮৯।

১৩. স্পেন্ডার, ডেল। ম্যান মেড ল্যাঙ্গুয়েজ। রাউটলেজ অ্যান্ড কিগান পল, ১৯৮০, লন্ডন, পৃ. ১৫-২২।

১৪. বসাক, সুনন্দা। বাংলার প্রবাদ। আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৭, কলকাতা, পৃ. ১৩১।

১৫. সেন, সুকুমার। 'বাংলায় নারীর ভাষা', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৩৩, নং ২ (১৯২৭): ৪৫-৬২।

১৬. বাটলার, জুডিথ। জেন্ডার ট্রাবল: ফেমিনিজম অ্যান্ড দ্য সাবভার্সন অফ আইডেনটিটি। রাউটলেজ, ১৯৯০, নিউ ইয়র্ক, পৃ. ৩৪-৩৬।

১৭. মুলভি, লরা। 'ভিজ্যুয়াল প্লেজার অ্যান্ড ন্যারেটিভ সিনেমা', স্ক্রিন ১৬, নং ৩ (১৯৭৫): ৬-১৮।

১৮. বসু, অভ্র। বাংলা স্ল্যাং সমীক্ষা ও অভিধান। প্যাপিরাস, ২০০৬, কলকাতা, পৃ. ১৮৩।

১৯.তদেব, পৃ. ১৮৪।

(প্রবন্ধে উল্লিখিত বিভিন্ন ধরণের "স্ল্যাং", সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ ব্যবহার করে থাকেন। যদিও যেগুলো ভদ্রসমাজে বা একাডেমিক পরিসরে ব্যবহৃত হয় না। তবে প্রবন্ধের মূল বক্তব্যকে 'জাস্টিফাই' করার উদ্দেশ্যে নারীদেহ সূচক কিছু 'নিষিদ্ধ', 'অশালীন' স্ল্যাং প্রবন্ধে উল্লেখ করতে হলো ইচ্ছাকৃতভাবে।)